জননী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

[লেখক তাঁর দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমায় যেসব ঘটনা বা চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছেন তারই পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে 'আমার দেশ, আমার স্বজন' শীর্ষক কাহিনিগুলির মধ্যে। প্রবল পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে যে-সমাজ তার সামনে আলোকবর্তিকার মতো তুলে ধরা হয়েছে সনাতন ভারতের স্বরূপ। সত্যের আধারে কাহিনিগুলি পরিবেশিত হলেও সাহিত্যিকের সরস উপস্থাপনাকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। জীবনের শিক্ষা ও পাঠের স্বাদুতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে অশীতিপর সাহিত্যিকের এই মর্মস্পর্শী রচনাগুলিতে। 'আমার দেশ, আমার স্বজন' শীর্ষক কয়েকটি রচনা ইতিমধ্যেই নিবোধত-র পাঠকগোষ্ঠীর কাছে সমাদর লাভ করেছে। আশা করি, এবারের লেখাটিও সমাদৃত হবে।—সঃ]

সিমলায় ঘুরতে ঘুরতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আলাপের ফাঁকে তিনি বললেন, ''এতদূর এসেছেন, কিন্নর প্রদেশটা ঘুরে দেখে আসুন।'' তাঁর প্রেরণাতেই আমরা রামপুর বুশেয়ারা পেরিয়ে এক সন্ধ্যায় কিন্নরের তাপ্‌রিতে সরকারি বাংলোয় আশ্রয় পেলাম।

তখন পথের অবস্থা খুবই খারাপ। দু-একখানা জিপ ওই ভাঙা পথের ওপর দিয়ে বোল্ডারের পাশ কাটিয়ে নাচতে নাচতে এগোয়। বাংলোতে দুদিন বসে ম্যানেজারবাবুকে অনেক সাধ্যসাধনা করে একটি আধভাঙা জিপ জোগাড় করা গেল। ড্রাইভারটি তরুণ। তাকে বললাম, ''তোমার জিপের অবস্থা খুব ভালো দেখছি না, সাংলা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে তো?'' ও বলল, ''আমার জিপের ওপর অংশটা ভেঙে গেছে, ছাউনি উড়ে গেছে কিন্তু নিচের অংশটা সবই ঠিকঠাক। পথ একেবারে ধ্বসে না গেলে আপনাদের ঠিক পৌঁছে দেব।'' আমরা তখন সাংলায় 'উখাং' উৎসব দেখার জন্য ব্যস্ত। এটি অসাধারণ এক ফুলের উৎসব।

আমরা দুজন জিপে উঠে বসলাম। টলমল করতে করতে জিপটা বোল্ডার ছড়ানো বড়ো রাস্তার ওপর গিয়ে উঠল। এরপর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলতে লাগল জিপ। আরও জোরে আমরা চেপে ধরলাম জিপটাকে। অনেক পথ ওঠানামা করতে করতে অনেক বাঁক বেড় দিয়ে এগোতে লাগলাম। শতদ্রু বয়ে চলেছে। বাঁদিকে দেখলাম আশ্চর্য এক পাষাণপুরী। জলের স্রোত পাষাণ কাটতে কাটতে তৈরি করেছে এক অসাধারণ পুরী। যেন পরিত্যক্ত এক পাষাণনগরী, দাঁড়িয়ে আছে মহাশূন্যের দিকে মাথা উঁচিয়ে।

একটা বাঁকের মুখে আমাদের জিপটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। পাশে গভীর গিরিখাদ। দেখলাম ড্রাইভার গাড়ি ঠিক করবার চেষ্টা করছে। বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। আমরা তখন উদ্বিগ্ন। মনে হল সমস্যা গভীরে। কাছে পিঠে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

হঠাৎ পেছনে একটা জিপের হর্ন বেজে উঠল। আমরা তখন পথে নেমে দাঁড়িয়েছি। এত সংকীর্ণ রাস্তা যে, আমাদের জিপকে ওভারটেক করে বেরিয়ে যাবার কোনও উপায় নেই। দেখলাম, পিছনের জিপ থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। সে-ই গাড়ি চালাচ্ছিল। বছর বিশের বেশি হবে না বয়স। পরনে দামি নীলাভ স্যুট। বেণী ঝুলছে, বেণীর নিচে জবাফুলের মতো লাল একটি ট্যাসেল। মেয়েটি এগিয়ে এসে আমাদের ড্রাইভারকে সরিয়ে দিল। নিজে দু-পাঁচ মিনিট গাড়ির

তলায় কী খুটখাট করল। তারপর আমাদের জিপে উঠে বসে স্টার্ট দিয়ে বাঁকের মুখ থেকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে জিপটা রেখে দিল।

ড্রাইভারের সঙ্গে মেয়েটি কিনৌর ভাষায় কিছু কথাবার্তা বলে আমাদের পাশ কাটিয়ে নিজের জিপের দিকে নেমে আসছিল, শ্রীমতী গিয়ে তার হাত ধরলেন। নিজের ব্যাগ থেকে একটা কমলা আর কিছু কাজু-কিশমিশ বের করে তার মুঠি ভরে দিলেন। ইংরেজি আর ভাঙা ভাঙা হিন্দির মাধ্যমে প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট ওদের দুজনের কথোপকথন চলল। পরে নিজের গাড়িতে উঠে মেয়েটি এগিয়ে চলে গেল। আমরা জিপে উঠে বসলাম। এবার শ্রীমতীর মুখ থেকে শুনলাম উদ্ধারকারিণীর সমাচার।

ও সাংলার দুদান পরিবারের মেয়ে। দুদানরা মহামন্ত্রীর পরিবার। মেয়েটির নাম সুনীলা নেগী। সুনীলার বাবা পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের উচ্চ শাসনকার্যে নিযুক্ত। তাই সুনীলা আর তার বোন নীলম ওখানেই পড়াশোনা করছে। আদবকায়দায় একেবারে দুরস্ত।

একটা পাহাড়ের শৈলশিরা বাস্‌পা নদীর ধার পর্যন্ত চলে এসেছে। কিন্নরের মহারাজ থাকেন রামপুর বুশেয়ারায়। তিনি উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সাংলাতে এলে একটি পাঁচতলা দুর্গে কয়েকদিন অবস্থান করেন। দুর্গের শেষপ্রান্তে দুদানদের তিনতলা বাড়ি। পরে আমরা সে-বাড়িতে একরাত অতিথি হয়ে কাটিয়েছিলাম। নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত একটা শেকলে বড়ো থেকে ছোটো সারিসারি ঘণ্টা বাঁধা। সেই ঘণ্টায় নাড়া দিলে ওপর পর্যন্ত শব্দ চলে যায়। তখন বাড়ির ভেতরের লোকেরা ব্যালকনিতে এসে অতিথিদের দেখতে পায়।

প্রথম দিন সাংলায় পৌঁছে একটিও আশ্রয় পাইনি। হন্যে হয়ে খুঁজেছি। 'উখাং' উৎসবের জন্য সরকারি ডাকবাংলো থেকে প্রতিটি আশ্রয়স্থলই পূর্ণ, প্রতি বাড়িতে দূর থেকে আত্মীয়েরা অতিথি হয়ে এসেছে উৎসব দেখার জন্য। ফিরে যাব তার উপায় নেই। ভাঙা জিপখানা অনেক আগেই উধাও হয়েছে। তখনও বেলা ছিল, আমরা চারদিকে ঘোরাঘুরি করছিলাম।

পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে বিয়াস নদী। কারছাম পর্যন্ত গিয়ে সে শতদ্রুর সঙ্গে মিলিত হবে। একদিকে কিন্নর-কৈলাসের চূড়া সূর্যালোকে ঝলমল করছে, তার ঠিক উলটোদিকে ধৌলাধার পর্বতের মাথায় বরফের মুকুট। কিন্নর-কৈলাস হিমালয়ের প্রধান শাখায় ছোটো-বড়ো অনেকগুলি বরফের শৃঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পর্বত ধীরে ধীরে নেমে এসেছে সানুদেশের দিকে। ছোটো ছোটো পাহাড়—দেওদার, কাইল, সিডার আর ফারগাছের জঙ্গলে ছাওয়া।

একেবারে নিচে বাস্‌পা ভ্যালি। সেখানে ছোটো ছোটো পাহাড় আর সমতলের ওপর বাড়িঘর। আমরা এসে পড়েছি সেপ্টেম্বরের চার তারিখে। পরদিন উখাং। বড়ো উন্মাদনা এই উৎসব ঘিরে। 'উ' মানে ফুল। 'খাং' মানে চেয়ে দেখা। ফুলের সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে দেখার উৎসব। কিন্নরের মানুষ ফুল ভালোবাসে। তাই তাদের সব উৎসবেই ফুলের সমারোহ। কিন্তু এই উখাং শুধু ফুলেরই খেলা।

ফুল আনতে যেতে হবে দূর দুর্গম পাহাড়চূড়ায়। পাহাড়ের গায়ে গভীর বনের ভিতর থেকে, আর তুষার পাহাড় থেকে ঝরে পড়া স্রোতোধারার তীর থেকে। এইসব ফুল দেওয়া হবে মাহাসু দেবতা, বদরিনাথ আর মহাকালীর চরণে; তারপর দেওয়া হবে প্রিয়জনের কবরীতে। এটাই রীতি উখাং উৎসবের। বাস্‌পা ভ্যালির যুবকেরা পাহাড়তলির জঙ্গলে ঢুকবে ভালো ভালো ফুল সংগ্রহের জন্য। ডঙর, লোসকার্চ, খাস্‌বল, গালচি—কত বিচিত্র রং আর গন্ধে ভরা ফুল গিরিগাত্র থেকে আনবে প্রতিযোগীরা। পরের দিন তারা বাস্‌পার সেতু পেরিয়ে এপারে একটা পাহাড়ের গুহায় ফুলভরা ঝাঁপিগুলি রেখে দেবে। ওই গুহাকে বলে 'উদাব্রো'।

মহারাজ সপারিষদ বসবেন মেলার মাঝখানে। জমজমাট মেলা, লোকে লোকারণ্য। মাহাসু, বদরিনাথ, মহাকালীর আবির্ভাব হবে দোলায় আর পালকিতে। জনতার মুখে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ঘনঘন জয়ধ্বনি।

যুবকেরা তাদের ফুলের সাজিগুলি পাহাড়ের গুহা থেকে বের করে আনবে। তারপর সারি দিয়ে চলতে থাকবে মহারাজের সামনে। মহারাজ প্রত্যেকের ঝাঁপি থেকে পছন্দমতো একটি করে ফুল তুলে নেবেন।

মেলার আগের দিন দুপুরে আমরা ক্রমাগত ঘুরে

ফিরছি একটুখানি রাতের আশ্রয়ের সন্ধানে। দূর থেকে একটা পাহাড় দেখলাম। তার তলায় খাঁজে খাঁজে পথ নেমে গেছে। পথের ওপর বৌদ্ধরীতির চমৎকার একটি তোরণ। ওই তোরণকে বলে 'কঙ্কনী'। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে নিচে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের দেখা গেল। স্থানীয় ভাষায় ওঁদের বলা হয় 'জোমো'। আমি পথে দাঁড়িয়ে রইলাম। শ্রীমতী আশ্রয়ের খোঁজে নিচে নেমে গেলেন।

ছোটো ছোটো কতগুলি কুটির। সামনে ফল-ফুলের বাগিচা। পেছনে পাহাড়ের গা ঘেঁষে পাইনের বন। তার ফাঁকে সাদা স্তূপ-মন্দির (লেবরাং) দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীমতী ওপরে উঠে এলেন। সমাচার এই, শ্রীমতীকে রাতের আশ্রয় অবশ্যই তাঁরা দিতে পারবেন কিন্তু পুরুষদের থাকার কোনও ব্যবস্থাই নেই।

আবার ব্যর্থ পর্যটন। বিভীষিকাময় রাতের আশ্রয়ের কথা ভেবে উদ্ভ্রান্ত আমরা একটা খানোর গাছের সামনে দাঁড়ালাম। টিলাপাহাড় দুদিকে কোণ সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথায় গাছটা ডালপালা বিস্তার করে রয়েছে। পাশ দিয়ে একটা জলধারা সোচ্ছ্বাসে নিচে ঝাঁপ দিয়ে নামছে। সে-জল নুড়ির নূপুর বাজাতে বাজাতে বয়ে চলেছে। একে বলে 'কুহল'।

পাহাড়ের ডানদিকের খাঁজে উচ্চবর্ণের কয়েকঘর মানুষের বসতি। বাঁদিকের খাঁজে একঘর মেথরের বাস। মেথর মারা গেছে অজানা এক অসুখে। তার যুবতী স্ত্রী বছর খানেকের ছেলেকে নিয়ে বাস করে ছোট্ট কুঁড়ের ভেতর। পাহাড়ি খাঁজের একটু নিচের দিকে তার স্লেটপাথরে ছাওয়া এক চিলতে ঘর। কোনওরকমে দুটি প্রাণী হাঁটু মুড়ে থাকতে পারে।

ওপরে উলটোদিকের খাঁজে এক ভদ্রমহিলা তাঁর শিশুপুত্রটিকে নিয়ে স্নান করছিলেন। হঠাৎ ছেলেটি কুহলের স্রোতে ভেসে নিচের দিকে চলে গেল। মেথর মেয়েটি তা দেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে তুলে নিল, বুকে নিয়ে উত্তাপ দিতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে ছেলেটির মা ওপর থেকে নেমে এসে হাঁকডাক শুরু করে দিল। ছোটোলোক 'ডোমাং'-এর এমন আস্পর্ধা যে সে বামুনবাড়ির ছেলেকে ছোঁয়! মনে হল, মেথর মা-টি বড়ো ভয় পেয়েছে। সে বাচ্চাটিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিল। ছেলেকে নিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তো দূরের কথা, তাকে গালাগালি দিতে দিতে ওপরে উঠে গেলেন মহিলা। ছেলেকে নিয়ে গেলেন পাশের 'ছাটকং'—গৃহদেবতার মন্দিরে। সেখানে শিশুকে মেথরের ছোঁয়া থেকে শুদ্ধ করে নিতে হবে।

আমরা মেথর-মায়ের কাছে নেমে গেলাম। সে একটি শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছে বলে সাধুবাদ জানালাম। শ্রীমতী তাকে বললেন, ''দিদি তুমি দুঃখ কোরো না। আমি বহুদূর বাংলাপ্রদেশ থেকে এসেছি। সেখানে এক কুলীন ব্রাহ্মণঘরের মেয়ে আমি। তুমি যে-কাজ করলে সেজন্য তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করা উচিত।'' বলতে বলতে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে মেথর মেয়েটিকে প্রণাম করলেন শ্রীমতী। সেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শ্রীমতীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। রাতে যে নিরাশ্রয়ে কাটাতে হবে, আমাদের মুখে সেকথা শুনে চমকে উঠল সে। বলল, ''এখন উৎসবের দিন তো, তাই কোথাও ঠাঁই পাওয়া যাবে না। কিন্তু রাতে খোলা জায়গায় কাটানো তো সম্ভব নয়।'' একটু কী ভেবে নিয়ে বলল, ''আপনারা কি আমার এই কুঁড়েতে কাটাতে পারবেন? খুব কষ্টে পড়বেন কিন্তু! তাছাড়া এটা মেথরের বাড়ি।''

তখন একটা আশ্রয় পেলে আমরা বর্তে যাই।

শ্রীমতী বললেন, ''আমাদের আশ্রয় দিয়ে তুমি পথে পথে এই দুধের বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে?''

শেষে ঠিক হল বাচ্চাকে রাখবেন শ্রীমতী, মা যাবে একটা আশ্রয়ে। বোতলে ছাগীর দুধ ভরে রেখে সে চলে গেল। বাচ্চাটা রাতে চুকচুক করে তাই খেল। শ্রীমতীকে জড়িয়ে ধরে বড়ো আরামে ঘুমুল সে। ভোরের আলো ফুটলে সামনে এসে দাঁড়াল মেথর-মা। শ্রীমতী আকুল হয়ে তার রাতের আশ্রয়ের কথা জানতে চাইলে সে হাত তুলে অদূরে একটি মাচা নির্দেশ করল। মাচার মাথায় চেরা কতকগুলো কাঠ ডাঁই করা। ওগুলো কীসের কাঠ? চিতা জ্বালানো হয়।

মেয়েটি বলল, ''কাল রাতে ওই কাঠগুলোয় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবছিলাম, আমাকে ঘিরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ভাবতে ভাবতে শীতের রাত কাটিয়ে দিয়েছি।''

মনে মনে বললাম—আসল অতিথিসেবার পুণ্য তুমিই অর্জন করলে জননী!